আকাঙ্খা, যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য

ন্যায়দর্শন সম্মত চতুর্বিধ যথার্থ অনুভবের মধ্যে শেষটি হল শাব্দবোধ। এই শাব্দবোধ বা বাক্যার্থজ্ঞানের প্রতি করণ হল পদজ্ঞান। বৃত্তিজ্ঞানসহ পদজ্ঞানজন্য পদার্থের উপস্থিতি হল ব্যাপার। আর শাব্দবোধ হল ফল। তাৎপর্যজ্ঞানকে এর সহকারী কারণ বলা হয়েছে। অন্নংভট্ট শাব্দবোধের আরও তিনটি কারণরূপে আকাঙ্খা, যোগ্যতা ও আসত্তির কথা বলেছেন। তিনি তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, 'আকাঙ্খা-যোগ্যতা-সন্নিধিশ্চ বাক্যার্থজ্ঞানে হেতুঃ' এখানে ব্যবহৃত 'চ' পদে তাৎপর্যকে বোঝানো হয়েছে বলে টীকাকারগণ দাবী করেন। এখানে আকাঙ্খা, যোগ্যতা ও আসত্তি বলতে আকাঙ্খার, জ্ঞান যোগ্যতার জ্ঞান ও আসত্তির জ্ঞানই বাক্যার্থ জ্ঞানের হেতু বুঝতে হবে বলে অন্নংভট্ট দীপিকা টীকাতে বলেছেন।

আকাঙ্ক্ষাদিকে শাব্দবোধের প্রতি কারণ না বলে আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞানকে কেন শাব্দবোধের প্রতি কারণ বলেছেন, তা আমরা এখন বুঝে নিতে পারি। আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞানকে কারণ না বলে যদি কেবল আকাঙ্ক্ষাদিকে শাব্দবোধের কারণ বলা হয় তাহলে আকাঙ্ক্ষাদির ভ্রম থেকে যে শাব্দবোধের ভ্রম হয়, তার ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে না। বিষয়টিকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। এমন হতে পারে যে কোন ব্যক্তি ভ্রম বশতঃ মনে করে, কোন বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষার ভ্রম জ্ঞান থেকে যে বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় তা অস্বীকার করা যায় না। যদিও সেই বাক্যার্থবোধ ভ্রান্তই হয়। এখন, যদি মাত্র আকাঙ্ক্ষার উপস্থিতির জন্য বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয়, তাহলে যেখানে আকাঙ্ক্ষার অভাব থাকে, সেখানে বাক্যার্থবোধেরও অভাব থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে, ভ্রান্ত হলেও বাক্যটির অর্থবোধ হয়। কাজেই মানতে হয় যে, বাক্যার্থবোধের প্রতি কেবল আকাঙ্ক্ষাদি নয় আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞানই বাক্যার্থবোধের প্রতি কারণ।

আকাঙ্খা ঃ

আকাঙ্খার লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, ‘পদস্য পদান্তরব্যতিরেকপ্রযুক্ত-অন্বয়-অননুভাবকত্বম্ঃ আকাঙ্খা’ অর্থাৎ একটি পদ আন্য একটি পদের অভাববশতঃ যদি অন্বয় অনুভবের জনক না হয় (বাক্যার্থবোধ না হয়) তবে এ পদগুলির মধ্যে আকাঙ্খা আছে বুঝতে হবে। যেমন রাম পদটি উচ্চারণ করলে প্রশ্ন জাগে রাম কি বা রাম কি করে ইত্যাদি। তখন যদি বলা হয় ‘গচ্ছতি’ তবে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়। রাম গচ্ছতি (রাম যায়) এই বাক্যে ব্যবহৃত দুটি পদ পরস্পরকে আকাঙ্খা করে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অন্বয় অনুভব হয় না। আবার অর্থও বোঝা যায় না। আবার যদি বলা হয় ‘গৌঃ অশ্বঃ পুরুষঃ হস্তী’- তাহলে এই পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক কোন আকাঙ্খা থাকে না। কারণ এখানে কোন অর্থ পরিস্ফুট হয় না। সুতরাং কেবল আকাঙ্খা নয় আকাঙ্খার জ্ঞানই শাব্দবোধের প্রতি কারণ হয়।

যোগ্যতা ঃ

যোগ্যতার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন, ‘অর্থাবাধো যোগ্যতা’ অর্থাৎ অর্থবাধের অভাব হল যোগ্যতা। বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থের পরস্পরের বাধের অভাবই যোগ্যতা। এখানে ‘বাধের অভাব’ বলতে ‘সম্বন্ধের অভাব’, ‘অন্বয়ের অভাব’কে বুঝতে হবে। একটি বাক্যের তাৎপর্যবোধের জন্য প্রয়োজন হল, বাক্যস্থিত পদগুলির দ্বারা যে সকল অর্থ বোধিত হয়, সে সকল পদার্থ যেন সম্বন্ধযুক্ত হয়। অর্থাৎ বাস্তবত পদার্থগুলি যে যে সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে, সে প্রকার সম্বন্ধই যেন পদগুলির দ্বারা বোধিত হয়। তথ্যগত কোন অসঙ্গতি বা বাধ যেন পদগুলির দ্বারা বোধিত পদার্থে প্রকাশিত না হয়।

এপ্রকার অসঙ্গতি বা বোধের অভাবই হল যোগ্যতা। বাক্যাস্থ্ পদসমূহের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে বাক্যটির যথাযথ অর্থবোধ হয় না। যেমন ‘জল দ্বারা স্নান করবে’- এই বাক্যের অর্ন্তগত বিভিন্ন পদের অর্থের (অর্থাৎ পদার্থের) মধ্যে কোন অসঙ্গতি(সম্বন্ধের অভাব) বা বাধ না থাকায় বাক্যটি থেকে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ‘জল’ হল শীতল তরল পদার্থ। এবং স্নান করার উদ্দেশ্য হল শরীর সংলগ্ন ধূলা, বালি ইত্যাদি আবর্জনা ধৌত করে শরীরকে মালিন্যমুক্ত ও শীতল করা - জল দ্বারা স্নান করলে বাস্তবিক তাই হয়। কাজেই অর্থবোধক বাক্যটির অর্থ এখানে যথাযথ হওয়ায় বাক্যটিকে শব্দপ্রমাণরূপে গণ্য করা যায়।

কিন্তু যদি বলা হয় ‘অগ্নি দ্বারা সেচন করবে’ (অগ্নিনা সিঞ্চেৎ) তাহলে এ প্রকার বাক্য থেকে যথার্থ শাব্দবোধ হবে না। তাই বাক্যটিও শব্দ প্রমাণ হবে না। কারণ, বাক্যের অর্ন্তগত পদগুলি যে সকল অর্থ বোধিত করে তাদের মধ্যে সম্বন্ধের অভাব বা বাধ থাকার জন্যই বাক্যার্থ যথার্থ হতে পারে নি। অগ্নি হল দাহক, যা দগ্ধ করে। আর সেচনের অর্থ জল নামক তরল পদার্থের দ্বারা কোন কিছু সিক্ত করা বা ভেজানো। কিন্তু অগ্নির কাজ দহন করা ভেজানো নয়। সেচনের কারণ জল, অগ্নি নয়। জলের কাজ ভেজানো, যা অগ্নির দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়।

বাক্যটিতে অগ্নির সাথে সেচনের কার্য-কারণভাবের উল্লেখ করা হলেও ‘অগ্নি’ ও ‘সিঞ্চন’ এই দুটি পদার্থের পরস্পর অন্বয়যোগ্যতা না থাকায় - অগ্নিতে সেচন বা সিঞ্চনের বাধ হওয়ায় - বাক্যটি থেকে যথার্থ শাব্দবোধ হবে না। এ প্রকার বাধযুক্ত বা যোগ্যতার অভাবযুক্ত বাক্য শব্দ-প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে ‘যোগ্যতা’কে বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু বা কারণরূপে উল্লেখ করলেও দীপিকাতে কিন্তু যোগ্যতাজ্ঞানকে বাক্যার্থবোধের কারণ বলেছেন।

আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান ও যোগ্যতাজ্ঞানের পার্থক্য হল, আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান পদবিষয়ক, আর যোগ্যতাজ্ঞান পদার্থবিষয়ক। পদের জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান হয় না এবং পদার্থের উপস্থিতি না হওয়া পর্যন্ত যোগ্যতার জ্ঞান হয় না।

আসত্তি বা সন্নিধি ঃ

আসত্তি বা সন্নিধির আলোচনা প্রসঙ্গে অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেছেন, বাক্যস্থ পদগুলির অবিলম্বে উচ্চারণ এবং পদ নির্দেশিত পদার্থগুলির সেইমত স্মরণই হল আসত্তি বা সন্নিধি (পদানাম্ অবিলম্বেন উচ্চারণম্ সন্নিধিঃ')। এখন যদি বাক্যস্থ পদগুলির বিলম্ব করে একটি পর অপর একটি উচ্চারণ করা হয় এবং তার ফলে পদার্থের পরম্পরা স্মরণও বিলম্বিত হয়, তাহলে সেই বিলম্বিত শাব্দবোধ থেকে বাক্যটির যথার্থ অর্থবোধও জন্মাতে পারে না।

বাক্যস্থিত পদগুলিকে যদি কাল-বিলম্ব না করে রীতিসম্মতভাবে উচ্চারণ করা হয়, তাহলে শ্রোতাও অবিলম্বে পদগুলির পূর্বাপররূপে শ্রবণপূর্বকপদার্থগুলি স্মরণ করে এবং সেই সব পদার্থের মধ্যে অন্বয় বা সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক বাক্যটির অর্থজ্ঞান লাভ করে। যেমন 'গাম্ আনয়' - 'গরুটি আনয়ন কর' বাক্যটির অর্ন্তগত পদগুলি স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হলে, অর্থাৎ অযথা বিলম্ব না করে একটির পর অন্যটি উচ্চারিত হলে শ্রোতার কাছে বাক্যের অর্থটি বোধগম্য হয় এবং সে তখন বক্তার নির্দেশ অনুসারে একটি গরু আনয়ন করবে। কিন্তু প্রহরে প্রহরে এক একটি পদ উচ্চারিত হলে, যেমন সকালে 'গরু', দুপুরে 'আনয়ন' এবং সন্ধ্যায় 'কর' পদ উচ্চারিত হয়, তাহলে উচ্চারিত পদগুলি থেকে যেসব পদার্থ স্মরণ হয়, তাদের মধ্যে সন্নিধি না থাকায়, বাক্যার্থবোধ হবে না। সন্নিধির অভাব বশতঃ এরূপ প্রহরে প্রহরে উচ্চারিত শব্দসহযোগে যে বাক্য তা শব্দ প্রমাণ নয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে ‘সন্নিধি’কে বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু বা কারণরূপে উল্লেখ করলেও দীপিকাতে ‘সন্নিধিজ্ঞান’কে বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ বলেছেন। এই মানসে তিনি দীপিকা টীকাতে বলেছেন, ‘আকাঙ্খাদি-জ্ঞানম্-ইত্যর্থ’ অর্থাৎ আকাঙ্খা, যোগ্যতা, সন্নিধির অর্থ হল আকাঙ্খার জ্ঞান, যোগ্যতার জ্ঞান ও সন্নিধির জ্ঞান।

আকাঙ্খাজ্ঞান ও সন্নিধিজ্ঞানের পার্থক্য হল, আকাঙ্খাজ্ঞান পদবিষয়ক, আর সন্নিধির জ্ঞান পদার্থবিষয়ক। পদের অর্থজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত আকাঙ্খাজ্ঞান হয় না এবং পদার্থের স্মরণ না হওয়া পর্যন্ত সন্নিধির জ্ঞান হয় না। আর এখানেই যোগ্যতাজ্ঞানের সাথে সন্নিধির জ্ঞানের মিল। কারণ যোগ্যতাজ্ঞান যেমন পদার্থ বিষয়ক, তেমনি সন্নিধিজ্ঞানও পদার্থ বিষয়ক। আকাঙ্খাজ্ঞানের মত পদ বিষয়ক নয়।

ন্যায়মতে বাক্যের অর্থ অনেক সময় বক্তার ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করে। কারণ, বক্তা বাক্যের অর্ন্তগত কোন একটি পদ বা কয়েকটি পদকে বিশেষ কোন অর্থে প্রয়োগ করে। বক্তার এই ইচ্ছ বা অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোন বোধ না থাকলে শ্রোতার পক্ষে বাক্যটি অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। বাক্যের অর্থবোধের জন্য এই কারণে অনেক সময় বক্তার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার তাৎপর্য নির্ণয় করতে হয়। যে পদার্থ বোধিত করার ইচ্ছায় বক্তা বাক্যস্থ কোন পদ উচ্চারণ করে, সেই ইচ্ছাই হল তাৎপর্য। কিন্তু বক্তার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় জানা যাবে কিভাবে ?

উত্তরে অন্নংভট্ট বলেন, প্রকরণের সাহায্যে অর্থাৎ বাক্য উচ্চারণকালে বক্তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা প্রসঙ্গ লক্ষ্য করে বক্তার অভিপ্রায় জানা যায়। যেমন ভোজন প্রকরণে অর্থাৎ ভোজনকালে কোন বক্তা যদি বলেন, 'সৈন্ধব আনয়নম্' অর্থাৎ সৈন্ধব নিয়ে এস। তখন শ্রোতা এই ভোজন প্রসঙ্গ বিচার করে সৈন্ধব লবণ নিয়ে আসবে। কারণ 'সৈন্ধব' শব্দের দুটি অর্থ - 'লবণ' ও 'সিন্ধু দেশীয় ঘোড়া'। তাহলে পারিপার্শ্বি অবস্থা বা প্রসঙ্গ বিচার করে শ্রোতাকে বুঝতে হয় বক্তার অভিপ্রায়। আবার যদি বক্তা যুদ্ধের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় যুদ্ধে গমন কালে কাউকে বলেন, 'সৈন্ধব আনয়নম্', তাহলে শ্রোতা প্রসঙ্গ বিচার করে সিন্ধুদেশীয় ঘোড়াই নিয়ে আসবে। তেমনি একইভাবে 'দণ্ড গ্রহণ কর' - এই বাক্যের 'দণ্ড' পদের দ্বিবিধ অর্থ - লাঠি এবং শাস্তি।

শ্রোতাকে বুঝতে হবে বক্তা কোন অভিপ্রায়ে এই বাক্য উচ্চারণ করেছেন। যদি বক্তার অভিপ্রায় হয় শাস্তি অর্থাৎ কোন অন্যায় কাজের বিচার প্রসঙ্গে বক্তা যদি এই বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহলে শ্রোতা বুঝবে যে বক্তা শাস্তি অর্থে দণ্ড শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। আবার যদি কোন ইতর প্রাণীকে তাড়ানো প্রসঙ্গে বক্তা উক্তরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন তখন শ্রোতাকে বুঝতে হবে বক্তা লাঠি অর্থে 'দণ্ড' শব্দটি উক্ত বাক্যে প্রয়োগ করেছেন। সাধারণতঃ দ্ব্যর্থক বা নানার্থক পদ দ্বারা গঠিত বাক্যের ক্ষেত্রেই বক্তার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় বিচার করে অনুধাবন করে বাক্যের অর্থ বা তাৎপর্য নির্ণয় করতে হয়।

অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু স্বরূপ লক্ষণে আকাঙ্খা, যোগ্যতা, আসত্তি বা সন্নিধির উল্লেখ করলেও স্পষ্টভাবে তাৎপর্যের উল্লেখ করেন নি। তিনি কেবল উক্ত লক্ষণে সন্নিধিশ্চ কথাটির অর্ন্তগত ‘চ’-কারের দ্বারা তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে টীকাকারগণ মনে করেন। তাৎপর্য বলতে এখানে তাৎপর্যের জ্ঞানকে বুঝতে হবে।

অবশেষে অন্নংভট্টের মত উল্লেখ করে বলা যায়, আকাঙ্খা, যোগ্যতা, সন্নিধি বা আসত্তি (এবং তাৎপর্য) বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু বা কারণ। এদের কোন একটিরও অভাব থাকলে বাক্যার্থবোধ হবে না। যেমন - ‘গরু, ঘোড়া, মানুষ এবং হাতি’ - এই পদগুলির যোগ্যতা ও সন্নিধি থাকলেও পারস্পরিক আকাঙ্খা না থাকায় পদগুলির দ্বারা যদি কোন বাক্য গঠিত হয়, তাহলে সেই বাক্যজন্য কোন অর্থবোধ হবে না।

আবার ‘অগ্নি দ্বারা সেচন করবে (অগ্নিনা সিঞ্চেত) - এই বাক্যটির অর্ন্তগত পদগুলির আকাঙ্খা ও সন্নিধি থাকলেও যোগ্যতার অভাবে বাক্যাথবোধ হবে না। ‘গরুটি আনয়ন কর’ (গাম্ আনয়নম্) বাক্যটির অর্ন্তগত পদগুলি অবিলম্বে উচ্চারণ না করে অযথা বিলম্বে প্রহরে প্রহরে উচ্চারণ করা হয় - পদগুলির মধ্যে আকাঙ্খা ও যোগ্যতা থাকলেও সন্নিধি বা আসত্তির অভাবে শাব্দবোধ হবে না ফলে বাক্যার্থজ্ঞানও জন্মাবে না।

একইভাবে ‘দণ্ড গ্রহণ কর’ বাক্যটির অর্ন্তগত ‘দণ্ড’ পদটি বক্তা কোন অর্থে প্রয়োগ করেছেন তা জানা না গেলে বাক্যটির তাৎপর্য জ্ঞান হবে না বাক্যার্থবোধ জন্মাবে না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ